নজর বেশি অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর ওপর

সবই হয়েছে, পরিকল্পনা মতো হয়েছে। গত রোববারের নির্বাচনের পর বুধবার নতুন সংসদ সদস্যগণ শপথ নিয়েছেন। আর টানা চতুর্থবারের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে আবার ক্ষমতায় বসলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবার শপথ হলো প্রধানমন্ত্রী ও নতুন মন্ত্রিসভার।

আমরা সবাই জানি যে, এই নির্বাচন হয়েছে বিএনপির বর্জন এবং প্রতিহত করার নামে সহিংসতার মাঝে। হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলোর নানা প্রকার বিরোধিতার মাঝে। নির্বাচনের আগে এবং পরে মার্কিন ও পশ্চিমা বিশ্বের মতামত বাংলাদেশের পক্ষে সেভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতোই তার কন্যা বারবার সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে তার মতো করে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে।

তবে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি যা-ই বলুক না কেন বড় কাজটা করতে হবে নিজেদেরই। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি অর্জন করলেও নানা কারণে স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থিক অবস্থা যে বিশেষ বদলায়নি তা স্পষ্ট। কম আয়ের মানুষের উপরে মূল্যবৃদ্ধির বিরূপ প্রভাবই এখন অর্থনীতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনকে ঘিরে দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ভালোভাবেই মোকাবেলা করে সাফল্যের সাথে নির্বাচন করেছে। এখন তার আবার পথ চলা শুরু। তবে এই চলাটা অর্থনৈতিকভাবে বন্ধুর হতে পারে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। নতুন সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে, তা হঠাৎ সৃষ্ট কোনো সমস্যা নয়। দীর্ঘদিন ধরে এমনটা চলছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রপ্তানি বাণিজ্যে মন্দাভাব, প্রবাসী আয়ে ধীর গতি, ডলার সঙ্কট এবং এর অতিরিক্ত দাম, রিজার্ভ সঙ্কট, ব্যাংক ও আর্থিকখাতে বিশৃঙ্খলা ও উচ্চ খেলাপি ঋণ, সরকারের ব্যয়ের চাইতে অতি কম আয় এবং বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপসহ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি স্তরই ঝুঁকিতে রয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা এবং আমাদের আর্থিকখাতের ভঙ্গুরতার সাথে বড় আকারে রয়েছে ডলার ও জ্বালানি সঙ্কটের বিষয়গুলো; যার কোনো তাৎক্ষণিক সমাধানের লক্ষণ স্পষ্ট নয়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে না পারায় জীবনধারণের ব্যয় কঠিন হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। খাদ্যের বাইরে জীবনের অন্য সব প্রয়োজনের জন্য খরচ করার মতো টাকা মানুষের হাতে থাকছে না। খাদ্যপণ্য, শিক্ষাসামগ্রী,

আবুল হাসান মাহমুদ আলী
অর্থমন্ত্রী

আহসানুল ইসলাম টিটু
বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

ওষুধের দাম নিয়ে চিন্তিত মানুষ। কোনোমতেই মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের নিচে থাকছে না। নতুন বাণিজ্যমন্ত্রীর জন্য এটাই বড় চ্যালেঞ্জ।

বোঝা যাচ্ছে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি। মাথাপিছু আয় বাড়লেও সেটা হয়েছে মূলত অতি ধনিক শ্রেণির। নিচের স্তরের মানুষের আয় বাড়ার হার উপরের স্তরের বা সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের আয় বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। ফলে এক বাংলাদেশে আসলে দুটি বাংলাদেশ বিরাজ করছে। কারণ সকলের আয় সমানভাবে বাড়েনি। উল্টে আর্থিক বৈষম্য বেড়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে দেশের মাত্র ২১ ব্যক্তির হাতে আছে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পদ। এক শতাংশ ধনকুবেররা এখন দেশের প্রায় ২৫ শতাংশের বেশি সম্পদের মালিক। বৈষম্যের এমন দশা আগে কখনও দেখা যায়নি। অর্থমন্ত্রী সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনে কতটা কি করতে পরবেন, তার চাইতে বেশি জরুরি তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সরকারের সামনে অসাম্য কমানোও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেটা কমানো যাবে কি না আমরা জানি না। কারণ অর্থনীতির মৌলিক জায়গাগুলো সঙ্কটেই আছে। বিনিয়োগে স্থবিরতা, কর্মসংস্থান কমে যাওয়া এবং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে দুর্ভোগ বেড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের। জ্বালানি সঙ্কট ও দাম, ডলার সংকটে এলসি করতে না পারায় দেশে উৎপাদন সক্ষমতা কমছে। অন্যদিকে বাড়ছে অর্থ পাচার। এগুলো অর্থনীতির জন্য ভালো লক্ষণ নয় মোটেই।

বাংলাদেশে কারও কারও জীবনধারা দেখলে, চাকচিক্যময় কিছু স্থাপনা দেখলে, রাস্তায় অতি দামি গাড়ি দেখলে এবং নেতাদের কথা শুনলে মনে হবে বাংলাদেশ ধনী দেশ হয়ে উঠছে। বিষয়টি আসলে তা নয়। বাংলাদেশে একটি শ্রেণির কাছে দ্রুত ধনী হওয়ার এক দেশ। সেটাই বৈষম্য তৈরি করছে। এই বৈষম্য কাঠামোগত। এর বড় কারণ কর জিডিপি অনুপাত খুবই কম। অর্থাৎ ধনীরা ঠিকমতো কর দিচ্ছে না। ফলে সরকারকে নির্ভর করতে হচ্ছে পরোক্ষ করের ওপর যা দরিদ্র মানুষের জন্য নিপীড়নমূলক হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনের আগে জমা দেওয়া এমপি নেতাদের হলফনামা দেখলেও দেখা যায় কত দ্রুত তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই হলফনামাও পুরোপুরি সত্য নয়। অনেক কিছু লুকানো হয়েছে। ধনীদের আয় যেভাবে বেড়েছে, বিনিয়োগের প্রবণতা ততখানি বাড়েনি, তারা ততখানি করও দিচ্ছেন না। মূল্য সংযোজন করের বোঝা দরিদ্রদের ওপরই বেশি। কথাটি শুধু ভ্যাট নয় যেকোনো পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেই এই একই ঘটনা ঘটে। পরোক্ষ কর চরিত্রে নিপীড়ক, অর্থাৎ কার আয় কম বা বেশি, এই করের হার তার উপরে নির্ভর করে না। অতি ধনী থেকে একেবারে নিঃস্ব, প্রত্যেকেই সমান হারে পরোক্ষ কর দিতে বাধ্য। যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে বেশি হারে প্রত্যক্ষ কর আদায় করা যায়। কিন্তু এখানেই বর্তমান ব্যবস্থার বড় কাঠামোগত সমস্যা। সেটা করতে পারছে না বা করা হচ্ছে না কারণ মন্ত্রী-এমপি হয়ে তারাই নীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন।

একটি দেশের অর্থনীতিকে তখনই সার্বিকভাবে ভালো বলা যেতে পারে, যখন তা সর্বস্তরের জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম। সেটা অনেকদিন ধরেই দেখছি না আমরা। একটি বড় চিন্তার জায়গা ব্যাংক ও আর্থিকখাতের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অপশাসন। দুর্নীতি আর্থিকখাতের সুশাসনকে ব্যাহত করছে। এক ব্যক্তির হাতে অনেকগুলো ব্যাংক, প্রাইভেট ব্যাংকগুলোতে মালিকদের দৌরাত্ম্য, সরকারি ব্যাংকে রাজনৈতিক প্রভাব; বড় বড় কেলেংকারির জন্ম দিয়েছে। দেশের ব্যাংকখাতে সুশাসন ফিরিয়ে আনা যে দরকার সেটা অতি সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছে। সঙ্কটের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে ব্যাংকিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য, সরকারি এবং বেসরকারি দায়িত্বকে পুনর্জীবিত করা প্রয়োজন।

জনগণের টাকা নিয়ে কার্য পরিচালনা করার কথা ব্যাংকগুলোর। অথচ মালিকদের অনেক অনৈতিক, অপরাধমূলক ও দুর্নীতি প্রবণতার আশ্রয় হয়ে উঠছে এই ব্যাংকগুলো। রাষ্ট্রায়ত্ত কিংবা ব্যক্তিগত সব ব্যাংকেই সংঘটিত অনেক বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি। যা ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় চিড় ধরিয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থাপকদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন।

সরকার সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারলে, ব্যাংকখাতে দুর্নীতির লাগাম টানতে না পারলে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারলে; সামগ্রিক অর্থনীতিই চাপের মধ্যে থাকবে। শুধু আর্থিকখাত নয়, সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি ও টাকা পাচার রোধে সরকারের ভাবনাটা স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। নতুন মন্ত্রিসভায় অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর কাজ বেশি, নজরও তাদের ওপরই।

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, প্রধান সম্পাদক
গ্লোবাল টেলিভিশন